

নজরুলের গান : বাণী ও সুর

সারোয়ার জাহান

১.

প্রকৃত অর্থে কবি নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) শিল্পসৃষ্টির সময় পেয়েছিলেন মাত্র দুই দশক। এই সময় সীমায় তাঁর সৃষ্টির পরিমাণ বিস্ময়কর। কবিতা-গান-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ-গল্প কী লেখেননি এই স্বল্প সময়ে! এগুলির যে-কোনো একটির সঙ্গে পরিচয় ঘটলেই পাঠক বুঝতে পারেন, তা-তে এক বিরাট প্রতিভার স্বাক্ষর উৎকীর্ণ।

বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে দরিদ্র এক পরিবারে নজরুলের জন্ম। নজরুল পিতৃহারা হন আট বছর বয়সে। এর পরে বড়ো অনিশ্চয়তা এবং দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে কেটেছে তাঁর শৈশব-কৈশোর। গ্রামের মজুব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পাশ করেছেন; ওই মজুবেই দশ বছর বয়সে তাঁকে শিক্ষকতা দিয়ে জীবনের প্রকৃত সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। পরে মাজার শরীফের খাদেমের কাজ, মসজিদে ইমামতি, বাবুর্চিগিরি, রুটির দোকানে ময়দামাখার চাকুরী-কৈশোরেই জীবিকার জন্য এতো কিছু! বর্ধমান হাইস্কুলে কিছুদিন পড়াশুনা করার পরে চলে যান ময়মনসিংহের দরিরামপুর হাইস্কুলে। সেখানে থেকে এক বছর পরে পলায়ন এবং শিয়ারশোল হাইস্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন। শিয়ারশোল স্কুলে পড়ার সময়েই ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন। নৌশেরায় ট্রেনিং নিয়ে চলে যান করাচীতে। ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টন ভেঙ্গে দেওয়া হয় তিন বছরের মাথায়। নজরুল চলে আসেন কলকাতায়। এই তথ্যগুলি আমাদের অজানা নয়। তবু নজরুলের যে কোনো সৃষ্টিকর্ম আলোচনা কালে এগুলি বার বার মনে করা জরুরী হয়ে পড়ে। এক দুর্মর অনিশ্চয়তা এবং অস্বচ্ছলতা পল্টনে যাবার আগে পর্যন্ত তাঁর অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হয়ে ছিলো। পল্টন জীবন তাঁর স্বাভাবিক মনোজীবনের সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও, মনে হয় সেখানেই তিনি কিছুদিন নিশ্চিন্ত জীবন লাভ করেছিলেন। সেখানে তিনি ফার্সি-জানা পাঞ্জাবী মৌলভীর কাছে ফার্সি শেখেন, যদিও কৈশোরে তাঁর চাচার কাছেই ফার্সি শিক্ষার হাতে খড়ি হয়েছিলো। তবে নজরুল ফার্সি কবি হাফিজকে মর্মে উপলব্ধি করেন পল্টনের মৌলভীর সান্নিধ্যে এসেই। হাফিজের কবিতা তাঁর মনে একধরনের নীরব উদ্‌মাদনা জাগিয়ে দেয়। অন্যদিকে এই সময়ে রুশ বিপ্লবের ঘটনা আর এক দিক থেকে তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। জারের নিগ্রহ থেকে রাশিয়ার জনগণের মুক্তির সংবাদ তাঁকে ভেতরে-বাইরে উদ্বেলিত করে। পল্টন জীবনের এ-দুটি ঘটনা যেন প্রকৃত অর্থেই তাঁর একহাতে 'বাঁশরী' আর এক হাতে 'রণ-তূর্য'-এর প্রতীকী রূপ পেয়েছিলো।

২.

বাঙালী পল্টন ভেঙ্গে দেওয়া হলে নজরুল কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তবে পল্টন থেকে লেখা তাঁর গল্প ও কিছু কবিতা কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এবারে শুরু হয় তাঁর প্রকৃত সাহিত্যজীবন। সাহিত্যিক মহলে তিনি কবি হিশেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু 'বিদ্রোহী' লিখে (রচনা ১৯২১, প্রকাশ ১৯২২) তিনি রাতারাতি খ্যাতির শীর্ষ স্পর্শ করেন। তখন থেকেই তাঁর নামের সঙ্গে 'বিদ্রোহী কবি' কথাটি অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে যায়।

তাঁর এই সাহিত্যিক খ্যাতি ও জনপ্রিয়তাকে সম্প্রসারিত হতে সাহায্য করেছিলো তাঁর স্বরচিত কবিতা পাঠ এবং স্বকণ্ঠে গীত রবীন্দ্র সঙ্গীত। প্রচণ্ড আবেগ মণ্ডিত আবৃত্তি এবং সেই সঙ্গে অসামান্য দরদজড়িত কণ্ঠের গান সহজেই শ্রোতাকে আচ্ছন্ন করে তুলতো। কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩) জানান, নজরুলের জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান উৎস তাঁর গান। তিনি বলেন,

❧ আমার মতে নজরুল খুব সুকণ্ঠ গায়ক ছিলো না। তবে প্রাণের সমস্ত দরদ দিয়ে সে গান গাইত। তাই তার গান সব শ্রেণীর লোককে আকর্ষণ করতো।.....তার গান ও কবিতার আবৃত্তি শোনবার জন্যে চটকলের বাঙালী মজুরেরা পর্যন্ত তাকে ডেকেছে।^১

স্মরণ করা যেতে পারে, এই সময়ে তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছেন বটে, কিন্তু নিজেও গীত রচনা শুরু করেছেন। ইতোমধ্যে তাঁর বেশ কিছু গজল বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে রসিকজনের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করে—এগুলির কিছু কিছু স্বরলিপিও প্রকাশিত হয়। ফলে গীতরচয়িতা এবং সুরকার হিসেবেও তিনি অচিরেই পরিচিত হয়ে উঠেছেন। তিনি নিজে তো বিভিন্ন জায়গায় নিজের গান গাইতে শুরু করেছেন, অনেক শিল্পীও তাঁর গান আগ্রহের সঙ্গে গাইছেন। বলা বাহুল্য নজরুলের গান জনপ্রিয়তা পেয়ে যায় অতি দ্রুতই। অথচ কোনো বাঙালী কবির পক্ষে গীতরচনা এবং সুরযোজনা তখন মোটেই কোনো নতুন ঘটনা ছিলো না। কেননা রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩-১৯১৩) রজনীকান্ত (১৮৬৫-১৯১০) অতুলপ্রসাদ (১৮৭১-১৯৩৪) বাংলা গানকে ইতোপূর্বেই বাণী ও সুরের ঐশ্বর্য দিয়ে একটি বিশিষ্ট লক্ষ্যে পৌছে দিয়েছেন। এবং এঁদের প্রত্যেকের গান বাণী ও সুর উভয় ক্ষেত্রেই তখন স্বতন্ত্র চিহ্নে চিহ্নিত। সুতরাং নজরুল এমন এক সময়ে গীতি রচনা করছেন যখন বাংলা গানের একটি স্বর্ণ-ঐতিহ্য নির্মিত হয়ে গেছে। তবু তাঁর গান স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে, জনপ্রিয়তায় পূর্ববর্তীদের অতিক্রম করে সহজেই। সমালোচক সুধীর চক্রবর্তী বলেন,

তিরিশ আর চল্লিশের দশকের অন্য কোনো গান জনপ্রিয়তায় তার ধারে কাছে পৌছায় নি, রবীন্দ্র সঙ্গীত তো নয়ই।^২

নজরুলের গান : বাণী ও সুর

স্বীকার করি অপরিমেয় জনপ্রিয়তা কখনোই শিল্প সাফল্যের একমাত্র মানদণ্ড নয়, কিন্তু একই ভূখণ্ডে, একই কালে এবং একই জানগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো শিল্পসৃষ্টি যখন জনপ্রিয়তায় আর সবলকে ছড়িয়ে যায়, তখন সেই জনপ্রিয়তার নেপথ্য উৎস অনুসন্ধান হয়ে ওঠে এই জন্যে যে, কোনো নিত্য ব্যবহার্য পণ্য এবং শিল্পের জনপ্রিয়তা কখনোই জনগোষ্ঠীর অভিন্ন রুচি থেকে উৎসারিত নয়। ন্যূনতম একটি শিল্পবোধ এর 'সঙ্গে' সম্পর্কিত। সুধীর চক্রবর্তী বলেছেন,

এই জনপ্রিয়তা যেমন গানের বিষয়গত লঘুতার জন্য তেমনই রাগ মিশ্রিত সুরতানের চমৎকার খোশ মেজাজী চালের জন্যও।^৫

এটি আপাত কারণ হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কারণ নয়। আর একথা সত্য বলে মেনে নিলে নজরুলের গানের বিশিষ্ট কাব্যসৌন্দর্য এবং স্বতন্ত্র সুর-লালিত্যকে অস্বীকার করা হয়। আসলে নজরুল বাংলা গানের বক্তব্য ও বক্তব্য প্রকাশের শৈলীতে, গঠন ও আঙ্গিকে, বিষয় ও প্রকারে এবং সর্বোপরি সুরের বিন্যাসে এমন কিছু নতুন মাত্রা যোজনা করেন যা তাঁকে পূর্ববর্তীদের থেকে অতি সহজেই আলাদাভাবে চিনে নিতে সাহায্য করে। তিনি অনায়াসেই সর্বস্তরের মানুষের কাছাকাছি চলে যেতে পারেন।

নজরুলের সামনে বাংলা গানের ঐতিহ্য ছিলো, কিন্তু তিনি পারিবারিক সূত্রে কোনো সাস্থীতিক উত্তরাধিকার পাননি। কৈশোরে মোল্লাগিরি ইত্যাদির সঙ্গে লেটো দলে যোগ দেন, লেটো দলের জন্যে বিভিন্ন পালাগান রচনা করেন। এ-ও জীবিকার উদ্দেশ্যে তবে সঙ্গীতের প্রতি তাঁর একটা সহজাত আকর্ষণ ছিলো, এঘটনা তার প্রমাণ। শিয়ারশোল কুলে পড়ার সময়ে শিক্ষক সতীশচন্দ্র কাজীলাল বালক নজরুলের সঙ্গীতানুরাগ দেখে তাকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তালিম দেন। পরবর্তীকালে ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খানের কাছে শিক্ষা নেন। 'বনগীতি' (১৯৩২) গীতিসংকলন তিনি ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খানকে উৎসর্গ করেন। ওস্তাদজীর মৃত্যুর পরে তাঁর শোক সভায় সভাপতির ভাষণে নজরুল নিজেকে তাঁর একজন 'দীনভক্ত সাগরেদ' বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া তিনি ওস্তাদ কাদের বক্স, মাস্তান গামা, মঞ্জু সাহেবের কাছেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তালিম নেন। তিনি সাস্থীতিক উত্তরাধিকার পারিবারিক সূত্রে পাননি, অল্পাঙ্ক পরিশ্রম এবং প্রখর প্রতিভাবলে অতি অল্প সময়ে সঙ্গীতের তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর কবি-স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গীতের এই জ্ঞান যুক্ত হয়েছিলো বলে গীতরচনা এবং সুর সংযোজনা তাঁর পক্ষে সহজতর হয়ে উঠেছিলো। নজরুল-পূর্ব রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ—এঁদের সবারই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে গভীর দখল ছিলো বলে তাঁরা

সাহিত্যিকী

পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাননি; তাঁদের স্বকল্পিত ভাব স্বসৃষ্ট সুরের বিন্যাসে বিকাশ লাভ করে স্বতন্ত্রপথ নির্মাণ করেছে। নজরুলের ক্ষেত্রেও এ-টি ঘটেছে আরো উজ্জ্বলভাবে।

বিষয়বৈচিত্র্যে নজরুলের গান বিশিষ্ট, সুরের কথায় পরে আসছি। এতো বিভিন্ন এবং বিচিত্র স্বভাবের গান, এতো বিপুল পরিমাণে কোনো বাঙালী কবি সৃষ্টি করেন নি। দেশাত্ববোধক গান, গজল, কাব্য গীতি, রাগাশ্রিত গান, ভক্তিগীতি, পল্লীগীতি, হাসির গান ইত্যাদি মিলে তাঁর সৃষ্টি সম্ভারকে পূর্ণ করে তুলেছেন। এগুলির মধ্যে আমি গুরুত্বের দিক থেকে প্রথমে দেশাত্ববোধক, গজল, কাব্যগীতি এবং পরে অন্যান্য শ্রেণীর গানের আলোচনা করতে চাই।

গজল সৃষ্টি করে নজরুল নতুনত্বের চমক সৃষ্টি করেন, কিন্তু দেশাত্ববোধক গানে তিনি সর্বস্তরের মানুষকে মাতিয়ে তোলেন। এই উন্মাদনার পেছনে সুরের ভূমিকা তেমন ছিলোনা, যেমন ছিলো ওজস্বী বক্তব্যের প্রত্যক্ষতা। নজরুলের আগে রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমমূলক গান বাঙ্গালীকে অভিভূত করেছিলো। দ্বিজেন্দ্রলালের গানে ভারতীয় ঐতিহ্য-গৌরব বীৰ্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে ঝংকৃত হয়েছিলো। অতুলপ্রসাদের কিছু স্বদেশাত্মক গানও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। কিন্তু নজরুলের এই শ্রেণীর গান তাঁর অন্যান্য গানের তুলনায় সংখ্যায় স্বল্প হলেও চরিত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাণী ও সুরের প্রসঙ্গ স্মরণ করেই একথা বলছি। দেখা যাবে নজরুল-পূর্ব স্বনামধন্য কবিদের দেশাত্ববোধক গানে মূলতঃ দেশের মাহাত্ম্য, সৌন্দর্য, ঐতিহ্য ইত্যাদিই বার বার আবেগের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ দেশবন্দনার মধ্যেই এই গানগুলির সার্থকতা সীমাবদ্ধ। এই আবেগী বর্ণনা মাতৃভূমি সম্পর্কে একটা অনাবিল মুগ্ধতার জন্য দেয়। এই মুগ্ধ আচ্ছন্নতাই অবশ্য দেশপ্রেমের উৎস মুখ। তবু এঁদের গানে সংগ্রামের কথা প্রবল হয়ে ওঠে না, প্রতিবাদের ভাষা বলিষ্ঠতা পায় না, বিদ্রোহ-বিপ্লব অংকুরিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে এই দেশভক্তিকে অর্থহীন ভেবে প্রতিবাদ করেছিলেন। নজরুলও ‘ধূমকেতুর পথ’ প্রবন্ধে স্পষ্টই বলেছেন,

প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তাঁরা [অর্থাৎ ইংরেজ] শুনবেন না। তাঁদের এতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদেরও এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুসুক্ষিটুকুকে দূর করতে হবে।^৪

তাঁর এই মনোভাব তীব্রভাবে ব্যক্ত হয়েছে দেশাত্ববোধক গানে। অবশ্য নজরুল তাঁর কোনো কোনো গানে স্বদেশভূমির বন্দনা করেছেন, তাকে ‘জননী’ বলে কল্পনা করেছেন; কিন্তু সেই জননী ‘রণরঙ্গিনী’, কখনো বা ‘রক্তম্বরধারিণী’।

আগেই উল্লেখ করেছি সৈনিক জীবনেই তিনি রুশ-বিপ্লবে উদ্দীপিত হয়েছিলেন। কলকাতায় ফিরে অল্পকালের মধ্যে ‘বিদ্রোহী’ কবিতা লেখেন, তা-তে তিনি

নজরুলের গান : বাণী ও সুর

বিস্ফোরিত হন শতমুখে। এই বিস্ফোরণ তাঁর দেশাত্মবোধক গানে বজ্রসুরে মস্তিষ্কিত হয়। এই গান শুধুমাত্র দেশের মুক্তি সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে থাকে না। সমালোচক কবি আতাউর রহমান যথার্থই বলেন,

এই গানে যে বিদ্রোহের আবেগ বর্তমান তা কেবল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দেশ্যেই নিঃশেষিত হবার কথা নয়। এ গানে যে বিদ্রোহের আভাস রয়েছে তা বিশ্ববিপ্লবের ইঙ্গিতবাহী।^৬

সমালোচক ‘তোরা সব জয়ধ্বনি কর’ গানটি প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করলেও, নজরুলের প্রায় সব দেশাত্মবোধক গান সম্পর্কে মন্তব্যটি প্রযোজ্য।

নজরুলের দেশাত্মবোধক গানের মধ্যে ‘দুর্গমগিরি কান্তার মরু’ সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা লাভ করে। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর (১৮৯৭-?) মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যুদ্ধে যাবার অনুপ্রেরণা খুঁজছিলেন নজরুলের এই গানে। তিনি বলেছিলেন,

আমরা যখন যুদ্ধে যাবো তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে, আমরা যখন কারাগারে যাবো তখনও তাঁর গান গাইবো। আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদাই ঘুরে বেড়াই.....বিস্তৃত নজরুলের “দুর্গমগিরি কান্তার মরু” মতো প্রাণমাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না।^৭

দিলীপকুমার রায় জানাচ্ছেন, কারারুদ্ধ নেতাজী কারাগারের লোহার বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে নজরুলের ‘কারা ঐ লৌহকবাট’ গানের কথা স্মরণ করতেন।^৮ কথিত আছে সে কালে রাজনৈতিক বন্দীরা জেলে ঢুকবার সময়ে ‘শিকল পরা ছল’, ‘চল চল চল উর্ধ্ব গননে বাজে মাদল’ এই সব গান গাইতেন।

‘দুর্গমগিরি কান্তার মরু’ গানে স্বদেশকে উত্তাল বিরুদ্ধ-স্রোতে নিমজ্জমান তরণী এবং দেশবাসীকে তরণীর বিপদগ্রস্থ যাত্রীর সঙ্গে তুলনা করে দুঃসাহসী কোনো এক সন্তানকে আহ্বান জানানো হয়েছে, যে দৃষ্ট কঠোর হাতে তরণীকে নির্ভুল কিনারায় নির্বিল্পে পৌঁছে দিতে পারবে। এই আহ্বানের লক্ষ্য তরুণ সমাজ, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে কবি যৌবনের গান গেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তরুণদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন ‘আধ মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা’। নজরুলের তরুণরা নবীনকণ্ঠে গেয়ে উঠেছে, ‘মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম’, শুধু তাই নয়, তারা ঘোষণা করে, ‘মোরা বিধাতার মতো নির্ভয়’। অন্য একটি গানে তারা জানান দেয়, তাদের পায়ের তলায় ঝড় তুফান মূর্ছিত হয়। তরুণ শক্তির মধ্যে তিনি জীবনের অপরাজেয় শক্তিকে প্রত্যক্ষ করেছেন,

বজ্র আলোকে মৃত্যুর সাথে
হবে নব পরিচয়

সাহিত্যিকী

জয় জীবনের জয় ॥

তিনি তাদের ডাক দেন,

চলরে চল তরুণ দল বাঁধন হারা

চল অমর সমরে, চল ভাঙ্গি কারা।

তিনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে পান-এই 'যৌবন-সুন্দর চিরচঞ্চল'-এর 'পদভরে ধরণী টলমল'। নজরুলের এই তরুণরায়ী বোধ করি, রবীন্দ্রনাথের 'বিধির বিধান কাটবে তুমি এমন শক্তিমান'? এই প্রশ্নের উত্তরে গেয়ে ওঠে, 'আমি বিধির বিধান ভাঙ্গিয়াছি, আমি এমনি শক্তিমান'। এরাই কালবোশেখীর ঝড়ে নিজেদের বিজয় কেতন উড়তে দেখে, সমস্বরে উল্লাসে ফেটে পড়ে-'তোরা সব জয়ধ্বনি কর'।

নজরুলের অনেকগুলি গানে কারাগার এবং শৃঙ্খল ছিন্ন করার কথা ঘোষিত হয়েছে। যেমন 'কারার ঐ লৌহকবাট', 'এই শিকল পরা ছল' 'আজি রক্ত নিশি ভোরে', 'বন্দি তোমায় কান্দি কারায়', 'শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি তরবারি' ইত্যাদি। এই গানগুলিতে সসন্ত্র সংগ্রামের কথা প্রথম ব্যক্ত হয়েছে। 'কারার ঐ লৌহ কবাট'-এ কারাগারের লৌহকবাট চূর্ণ করে 'ধ্বংস নিশান' উড়িয়ে বন্দীশালায় আগুন জ্বালাবার ডাক শোনা গেছে; 'এই শিকল পরা ছল' গানের শেষ চরণে অস্থি দিয়ে বজ্রানল জ্বালাবার অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছে; 'আজি রক্ত নিশিভোরে' গানে কারাবন্দীদের 'মুক্তিকোলাহল'-এ আবগাশ বাতাস মুখরিত হবার সংবাদ আছে। তবে মুক্তি সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ গান 'জাগো অনশন বন্দী ওঠোরে যত'। এই গানটি "The Internationale" এর বঙ্গানুবাদ। মুজফ্ফর আহমদের মতে এই অনুবাদ বাংলা ভাষাতে তো বটেই 'ভারতীয় ভাষাগুলিতে যত সব অনুবাদ হয়েছে সে-সবেরও 'সেরা'।^৮ এই গানে বলা হয়েছে 'মূল সর্বনাশের এরে ভাঙ্গিব এবার', কামনা করা হয়েছে- 'কেহ রহিবে না আর পর পদ-আনত'।

শ্রেণী সংগ্রামের চেতনা তাঁকে পূর্বসূরীদের থেকে পৃথক করেছে। বাংলা গানে শ্রেণী সচেতনতার প্রবর্তক তিনি।^৯

সমালোচক আতাউর রহমানের একথা সর্বার্থে সত্য। তিনি প্রথম রচনা করেন কৃষকের গান, দীবারের গান এবং আরো অনেক শ্রমজীবী মানুষের গান। নজরুলের আগে কেউ এই শোষিতদের হয়ে গান গেয়ে ওঠেননি, 'জগদ্বাসী' এই অবহেলিত চাষীদের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে কেউ বলেন নি 'আমরা মরতে আছি—ভাল করে মরব এবার চল' এবং চাষীদের ঐক্য শক্তিতে সশ্রদ্ধ আস্থা জ্ঞাপন করে উদ্ধত কণ্ঠে জানিয়ে দিতে চান নি 'দেখবে এবার সভ্য জগৎ চামার কত বল'। অথবা শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গভীর মমতায় কেউ বলেন নি, 'আজ মানব কুলের কালি মেখে আমরা কালো কুলির দল।'

নজরুলের গান : বাণী ও সুর

শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে কোনো কবির কণ্ঠে গর্জন শোনা যায়নি- ‘ওরে ধ্বংস পথের যাত্রী দল!’ কাঁধে শাবল হাতুড়ি নিয়ে এগিয়ে চল’- যার হাতের সুখে গড়েছি, তা পায়ের সুখে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবো। কেননা পাহাড় ভেঙ্গে তুষার গলিয়ে আমাদের শ্রম ও শরীরের রক্ত বইয়ে মরুভূমিতে সোনার ফসল ফলাই, কিন্তু ‘ক্ষুধায় বিন্দু জল’ পাইনি। অতএব সেই বঞ্চনাকারীকে ‘মার ছোবল’।

ধীবরদের বললেন,

‘আমরা নীচে পড়ে রইব না আর শোনরে ওভাই জেলে,
এবার উঠাবেরে সব ঠেলে’

তাদের মনে সাহস জাগিয়ে তুললেন, ‘ঐ আঁশ বটিতে মাছ কাটি ভাই কাটবো অসুর এলে’। অবশ্য নিপীড়িত বঞ্চিত সর্বহারাদের পক্ষে দৃপ্ততম আহ্বানের সংহত এবং প্রচণ্ডতম প্রকাশ ঘটেছে ‘জাগো অনশন বন্দী’ গানে। সেখানে সর্বহারাদের জাগিয়ে তোলা হয়েছে এই অভয়বাণী শুনিতে যে, সর্বহারার দল হবে ‘সর্বজয়ী’। তিনি দু’হাত বাড়িয়ে তাদেরকে ডাকেন,

ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম মাঝ
নিজ নিজ অধিকার ছুড়ে দাঁড়া সবে আজ।

নজরুল বেশ কিছু ইসলামী গান রচনা করেছিলেন, যাতে মুসলিম জাতির গৌরবময় অতীত ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের পুনর্জাগরণের আহ্বান জানানো হয়েছে। ইসলামধর্মের মূলে সর্বমানবীয় কল্যাণের বাণী নিহত। ইসলাম ধর্মের পুনর্জাগরণের মধ্যে তিনি সমগ্র মানব জাতির মুক্তি ও সাম্যের পথ খুঁজেছিলেন। ধর্মীয় জাগরণ এখানে মূল লক্ষ্য নয়। মুসলিম পুনর্জাগরণমূলক গানের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হ’লো ‘বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা,’ ‘ভুবনজয়ী তোরা কি সেই মুসলমান’ ‘জাগে না সে জোশ লয়ে আর মুসলমান,’ ‘দিকে দিকে পুনঃ জুলিয়া উঠিছে দীণ-ই ইসলামী লাল মশাল,’ ‘ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি’ ইত্যাদি।



নজরুলের দেশাত্মবোধক কিছু গানের মধ্যে হিন্দু মুসলমানের মিলন কামনা ব্যক্ত হয়েছে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে। তিনি উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্য প্রতিষ্ঠার তাগিদ অনুভব করেছিলেন এবং এই কাজকে ঐশ্বরিক নির্দেশ বলে বিশ্বাস করতেন। পরিমল গোস্বামী জানিয়েছেন, নজরুল তাঁকে বলেছিলেন,

জানেন আমি ভিতরে ভিতরে কি অনুভব করছি? আমি অনুভব করছি একটা বিরাট কর্তব্য আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে। সে হচ্ছে হিন্দু মুসলমানের মিলন। এ মিলন ঘটাতে আর কেউ পারবেনা। ভগবান আমাকে দিয়ে এই কাজ করাবেন।^{১০}

সাহিত্যিকী

বহুতঃপক্ষে নজরুলের আগে এই উদ্দেশ্যে কোনো বাঙালী কবির গানে তেমন বলিষ্ঠ উচ্চারণ শোনা যায়নি। তিনি ‘ছুঁংমার্গ’ প্রবন্ধে বলেছেন সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতির মূলোৎপাটন ক’রে,

এই অতিমানী দিগকে বুক দিয়া ভাই বলিয়া পাশে দাঁড় করাইতে পারিলে ভারতে মহাজাতির সৃষ্টি হইবে, নতুবা নয়।”

১৫

হিন্দু মুসলমানের মিলনের লক্ষ্যে তিনি রচনা করেন, ‘ভারতের দুই নয়ন-তারা হিন্দু মুসলমান’, ‘মোরা একই বৃন্তে দু’টি কুসুম হিন্দু মুসলমান’, ‘হিন্দু আর মুসলিম মোরা দুই সহোদর ভাই’, ‘জাতের নামে বজ্রাতি’ প্রভৃতি গান। এছাড়া তিনি নারী জাগরণমূলক গানও রচনা করেন ‘জাগো নারী জাগো বহি শিখা’ গানটি সেগুলির মধ্যে অন্যতম।

মার্চ সং বা কুচকাওয়াজের গানের নজরুলই প্রবর্তক; নিঃসন্দেহে তাঁর সৈনিক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিলো। ‘চল চল চল’ ‘টলমল টলমল পদভরে,’ ‘অগ্রপথিক রে সেনাদল’ প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি।

নজরুলের প্রথম যুগসচেতনতা এবং প্রবল রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে দেশপ্রেমমূলক গানে, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর সহজাত মানবতাবাদ। তাঁর অনেক বিখ্যাত দেশাত্মক গান রচিত হয়েছে কোনো না কোনো রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক ঘটনাকে উপলক্ষ করে; কিন্তু লক্ষ্য করা যাবে সেগুলি বিশেষ উপলক্ষকে অতিক্রম করে সর্বকালীনতার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। এই গানগুলির আয়তন কখনো দীর্ঘ, কখনো নাতিদীর্ঘ, কখনো বা সংক্ষিপ্ত। এগুলির উদ্দেশ্য যেহেতু জাগিয়ে তোলা, রক্তে-চৈতন্যে, শিরায়-উপশিরায় আলোড়ন সৃষ্টি করা, সেহেতু বক্তব্য প্রাধান্য পেয়েছে, কাব্যসৌন্দর্য হয়ে পড়েছে গৌণ। ‘মোরা মারের চোটে ভূত ভাগাবো মস্ত দিয়ে নয়’—এখানে বক্তব্য ও ক্ষোভের প্রত্যক্ষতাই লক্ষ্য অন্য কিছু নয়। উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার আছে, গগণবিদারী কণ্ঠের ডাক আছে—তাই শব্দও এসেছে তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। ‘হুশিয়ার’, ‘তুফান’, ‘জোয়ান’, ‘হিম্মৎ’, ‘দামামা’, ‘আমামা’, ‘শির’, ‘নয়া জামানা’ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে কবির আহবানকে উদাত্ত এবং জলদ গম্ভীর করার জন্যে। ধ্বনি মাধুর্যের কথা ভেবে এই শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়নি, শব্দগুলির অন্তর্নিহিত বলিষ্ঠতা, শক্তি ও উদ্দামতার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে বেশি। বাংলা কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করে নজরুল যুগান্তর সৃষ্টি করেছিলেন এ তথ্য নতুন নয়। নজরুল ব্যবহৃত শব্দরাজির সঙ্গে আমাদের অপরিচয় ছিলোনা; কিন্তু সঙ্গীতের মতো শিল্পেও এগুলি যে প্রায় অপরিহার্য এবং ভাব প্রকাশী হয়ে উঠতে পারে তা আমাদের অজানা ছিলো।

নজরুলের গান : বাণী ও সুর

বক্তব্য প্রধান এই গানগুলি কারুকাজহীন সরল সুরে মানুষের কণ্ঠে সহজেই প্রাণস্ফূর্তি লাভ করেছে। যেহেতু এগুলি একক কণ্ঠের গান নয়, জনতার গান, সেহেতু রাগ-রাগিনীর মিশ্রণ সত্ত্বেও এর সুর লীলায়িত হয়েছে সভা, সমিতি অথবা মিছিলের সম্মেলক কণ্ঠের দাবী অনুযায়ী। এই সুর উচ্চমাম থেকে নিম্নমাম পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে বিহার করেছে, কিন্তু জনতার সঙ্গীত-অপটু কণ্ঠ সুরে-বেসুরে অনায়াসেই তাকে অনুসরণ করতে পারে। জনতার কণ্ঠ এই সুরে অনায়াসচারী হতে পারে এই কারণে যে এর ভেতরে বাইরে এমন একটা ছন্দ ও দোলা আছে যা জীবনের চলার ছন্দের মতোই স্বতঃস্ফূর্ত। এই ছন্দ-দোলা মানুষের মনকে নাড়িয়ে দেয়, শরীরকে দুলিয়ে দেয় অজ্ঞাতে। গণসঙ্গীতের সার্থকতা এখানেই। বলতে পারি; একমাত্র নজরুলের দেশাত্ববোধক গানই জাতীয় সঙ্গীতের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলো।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী গানে লোকগীতি, বিশেষত বাউল সুর ব্যবহার করেছেন; দ্বিজেন্দ্রলালের ভিত্তি ভারতীয় রাগ-রাগিনী হলেও প্রকাশভঙ্গি পাশ্চাত্য সুর প্রভাবিত। নজরুলের অতিবিখ্যাত দেশাত্ববোধক গানগুলিতেও রাগ-রাগিনীর অতি সূক্ষ্ম ব্যবহার আছে, কিন্তু যেহেতু এগুলির সৃষ্টি জনসমষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে, সেহেতু সুর-বিন্যাসে কেবল রাগের রূপরেখাটুকু বজায় থেকেছে, অর্থাৎ রাগের ছায়ায় এর সুর গড়ে উঠেছে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে পারি, ‘দুর্গমগিরি’-তে কেদারা ও ইমন, ‘জাগো অনশন বন্দী’ গানের ভিত্তি ভীমপলশ্রী, ‘তোরা সব জয়ধ্বনি কর’-এ বিভাস এবং ‘করার ঐ লৌহকবাট’-এ ইমনি বিলাবলের ছায়া আছে।

নাজরুলের
৩. ১৯৩৫

অতুলপ্রসাদের কথা মনে রেখেও বলা যায়, নজরুলেই বাংলা গজলের প্রথম স্রষ্টা। আগেই উল্লেখ করেছি পল্টন-বাসকালে নজরুল হাফিজের গজলের সঙ্গে পরিচিত হন এবং বাংলা গজল রচনায় অনুপ্রেরণা বোধ করেন।

গজলের উদ্ভব ও বিকাশ পারস্য দেশে। কবি রুমী, হাফিজ পারসী গজলের শ্রেষ্ঠ রূপকার। গজল মূলতঃ প্রণয় সঙ্গীত। তবে তার ভাব দ্ব্যর্থক। এতে পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার সঙ্গে মানবিক প্রেমের অঞ্জন দু-ই লভ্য। আবার কখনো নরনারীর প্রেম ঐশ্বরিক প্রেমের প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতীয় সঙ্গীতের ধারায় মিশে পারস্য গজলের চরিত্র বদলে যায়। এই বদল ঘটে ভাব ও সুর উভয় ক্ষেত্রে। ভারতীয় ভাষায় প্রথমে উর্দুতে গজল এক নবজন্ম লাভ করে। ভাবের দিক থেকে দ্ব্যর্থকতা বিসর্জন দিয়ে উর্দু গজল হয়ে যায় একার্থক। মানবিক প্রেম ও অতীন্দ্রিয় দার্শনিকতা স্বতন্ত্র ধারায় বাহিত হতে থাকে। সেই সঙ্গে উর্দু গজলে প্রেম বর্ণনা লঘুতর হয়ে আসে, অন্য পক্ষে অতীন্দ্রিয় দর্শন হয়ে ওঠে গুরুভার। আর সুরের ক্ষেত্রে দেখা যায়, পারসী গজলের আবৃত্তিময়

সাহিত্যিকী

সুরশৈলীর পরিবর্তে উর্দু গজল বিকাশের পথ পায় রাগ-রাগিণীর প্রত্যক্ষ আবহে, অলংকৃত হয় সুরের নানান কারুকর্মে। পারসী গজল দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও নজরুলের গজল অনেকটা উর্দু গজলের সমধর্মী। তাঁর গজলের ভাব একার্থক, প্রতীক বা রূপকের আশ্রয় সেখানে নেই, মানব প্রেমের বর্ণনে তা সমৃদ্ধ।

গঠনের দিক থেকে বলা যায় গজল কতগুলি দ্বিচরণবিশিষ্ট স্তবকের সমন্বয়ে নির্মিত কবিতা। আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেন,

প্রায় কোনো গজলই পরিচিত অর্থে.....একটি কবিতা নয়, পাঁচ সাতটি বা পনের কুড়িটি শের-এর সমষ্টি, কেবল মাত্র ছন্দ ও মিলের ঐক্যে একত্রিত; ভাবের ঐক্য না থাকারই কথা, থাকটা ব্যতিক্রম।..... প্রকৃত প্রস্তাবে দুই-পংক্তি সংবলিত একটি শেরই প্রকৃত স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা।^{১২}

নজরুলের বেশির ভাগ গজল এই আদর্শে রচিত। প্রতিটি স্তবকে স্বতন্ত্র চিত্র বা ভাবরস উপভোগ্য। ‘বসিয়া বিজনে কেন একা মনে’ গানটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করতে পারি। এর প্রতিটি স্তবকে এক একটি ভিন্ন চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। নায়িকাকে ‘পানিয়া ভরনে’ যাবার আহ্বান প্রথম স্তবকে, দ্বিতীয় স্তবকে চখা-চখীর একান্ত মিলনের ইঙ্গিত। পরবর্তী তিন স্তবকে চিত্রিত নানান দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় সন্ধ্যা আসন্ন। কিন্তু শেষ স্তবকে কোনো এক বে-দরদীর ওই রাঙ্গা পদযুগলে মালা হয়ে জড়িয়ে থাকার কল্পনা আছে, সেই সঙ্গে বলা হয়েছে ‘কবি পড়িল দায়ে পায় রাখি তারে না গলে পরি’। তবে বিচ্ছিন্ন চিত্রের সমাহার হ’লেও সমগ্র গানটিতে সন্ধ্যা আগমনের পূর্বাভাস গড়ে ওঠে। সমালোচক করুণাময় গোস্বামী নজরুলের এই শ্রেণীর আরো কিছু গজল চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।^{১৩}

আবার নজরুলের কিছু গজল দ্বিপদী ছন্দে রচিত হ’লেও পুরো গানটি ভাবের ঐক্যে বাঁধা; সবগুলি স্তবক মিলে একটি অখণ্ড চিত্র বা ভাবের জন্ম দেয়। তাঁর এই শ্রেণীর গজলের সংখ্যা বেশি। একটি বিখ্যাত গজল ‘দাঁড়ালে দুয়ারে মোর’,-এতে অচেনা এক রমণীর কথা বলা হয়েছে যে শেষ বেলায় প্রেম-ভিখারিণীর বেশে এসে দাঁড়িয়েছে। কবি ভেবে পান না তিনি এই ঝড়ের পাখিকে কি দিয়ে আগলে রাখবেন, কি দিয়ে তার বেদনা মুছিয়ে দেবেন! তাকে বুকে বেঁধে রাখতে গিয়ে দু’চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে, চোখে ধরে রাখতে গেলে বুকে বেদনা জাগে—কবি ভেবে পান না এই ‘স্বপন মধুচারিণী’ কে নিয়ে কি করবেন! গোটা গানে এই বোধ অখণ্ডভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। তেমনিভাবে ‘পথ চলিতে যদি চকিতে’ গানে প্রিয়ার এই করুণ আবেদন ধ্বনিত হয়েছে যে, আজকের এই বিচ্ছেদের পরে কখনো দেখা হলে যেন সে আগের মতোই মদির চোখে তাঁর দিকে ফিরে চায়, সেই প্রিয় নামে ডাকে। তাকে ‘বিরহ-বিধুর’ দেখে তার প্রিয় যদি বেদনা অনুভব

নজরুলের গান : বাণী ও সুর

করে তাহ'লে সে দূরে চলে যাবে, পথের কাঁটা হয়ে থাকবে না। সমগ্র গানটি গড়ে উঠেছে একটি বেদনাদীর্ঘ অভিমানকে কেন্দ্র করে। এই শ্রেণীর আরো অনেক গান উল্লেখ করা যায়।

গজলের অন্তর্গত কাব্য কবিতাগুলি সুর সহযোগে গীত হয়। কিন্তু সুর ছাড়াও এগুলির কাব্যরস আশ্বাদ্য, কবিতা হিসেবে পাঠ্য। সুরের পরিচর্যায় এর অন্তর্নিহিত রস ও সৌন্দর্য নতুনতর মাত্রা ও দ্যোতনা লাভ করে।

‘পাষাণের ভাঙ্গালে ঘুম’ গজলটিতে প্রেমিকের নিখর সুপ্ত হৃদয়ে প্রেমসম্মগ্নতার চিত্র শিল্পিত হয়েছে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প প্রভৃতি কবিতার বিভিন্ন অনুষঙ্গের সহায়তায়। প্রিয়ার প্রেমের স্পর্শে তার পাষাণ হৃদয়ে সুরের নির্ঝর বয়ে গেছে। এখানে প্রেমিকের হৃদয়কে পাষাণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, আর সুরগুলিকে তুলনা করা হয়েছে গলিত পাষাণের স্ফূর্তিময় তুষার ধারার সঙ্গে। যে মন ছিলো বিবাগী-উদাসী এবং নিঃস্পন্দ, সে আজ প্রিয়ার বাহু বন্ধনের জন্যে ব্যাকুল, কতো যুগের নীরব কান্না সহসা প্রিয়ার ‘ও পায়ে লুটাতে চায়’। কারণ তার চরণের ছন্দে গানের মুকুল মঞ্জুরিত হয়ে উঠছে, তার কবরীর বন্ধনে সুরের বকুল আত্মহুতি দেবার জন্যে আবুল। সবশেষে ছোট্ট একটি কলিতে সে জানিয়ে দেয় এই সংবাদ—‘ঐ হরিণ চোখের চাওয়ায়’ তার মনোজীবনের আকাশ বাতাস চমকিত। রোমান্টিক কবি-কল্পনা, বিশেষত, ‘কতজনমের কাঁদন ও পায়ে লুটাতে চায়’-এই একটি মাত্র চরণেই গজলটি একটি শিল্পোত্তীর্ণ কবিতার রূপ পেয়েছে বলে মনে করি।

তেমনভাবে ‘আধো আধো বোল লাজে বাধো বাধো বোল’ গানে নবযৌবনার হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব এবং তা প্রকাশ করতে না পারায় সুখের আকুতি প্রতিটি চরণে ব্যক্ত হয়েছে। তার লজ্জানত ক্ষুদ্র অভিব্যক্তিগুলি অর্থে ও বর্ণে তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে কবি কল্পনার কল্যাণে। অবশেষে, ‘যে কথাটি বলিতে সই গালে পড়ে টোল’ চরণটি স্মরণীয় হয়ে থাকে।

প্রেমিক প্রেমিকার পরস্পরের কাছে চাওয়ার বস্তু অবধারিতভাবেই প্রেম, কিন্তু ‘তোমার বুকের ফুলদানিতে’ গানে প্রেমিক তার প্রেমিকার সৌন্দর্য এবং আনন্দ-বেদনার উৎস বিন্দুতে লীন হতে চায়। তাকে পাবার বাসনা এখানে অনুপস্থিত, সে প্রবলভাবে উপস্থিত থাকতে চায় প্রিয়ার মিলন রাতে, বলে ‘ধূপ হবো মিলন রাতে’ এবং ‘গহীন ঘুমে স্বপন হবো জল হবে নয়ন পাতে’। শুরুতেই সে জানিয়ে দেয় প্রিয়ার বক্ষের কুসুম হয়ে অলক্ষ্যে ঝরে গেলেও ক্ষতি নেই—এই নীরব আত্মবিসর্জনেই তার জীবন এবং মরণের

সাহিত্যিকী

সার্থকতা। বলা বাহুল্য এই গানে কল্পনার নতুনত্ব নেই, কিন্তু কল্পনার গতানুগতিকতা আবেগের উষ্ণতায় নতুনত্বের মহিমা পেয়েছে।

নজরুলের কিছু গজল আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহারে অসাধারণত্ব লাভ করেছে। এই শব্দগুলির প্রয়োগ-কুশলতা এই অসাধারণত্বের উৎস। স্মরণীয়, এই ধরনের প্রায় প্রতিটি গানে সুরা-সাকী-পানশালা এবং গুলবাগিচার প্রসঙ্গে এসেছে। যেমন ‘তোমার আঁখি কসম সাকী’ গানে প্রেমিক আঙ্গুরপিষ্ট পানীয়ের প্রত্যাশী নয়, কেননা সাকীর চোখের দৃষ্টি সুরার নেশা জাগিয়ে দেয়। হৃদয়ের গোলাব-শূন্য গুলিস্তানে বুলবুল কেঁদে যায়, প্রেমিক জানে প্রিয়র কাছে এই গুল্যতা এবং ‘ব্যথা ভোলার দারু আছে’। সে প্রিয়াকে বলে আমি কি চাই তা একমাত্র তুমিই জানো এবং ‘খোদা জানে’। তবু যদি তুমি আমাকে বিমুখ করো তাহলে ‘নসীব গিয়াছে যখন, যাক ঈমান শরাব পানে’। এছাড়া, আরবী-ফারসী শব্দসমৃদ্ধ গানের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য হলো, ‘এলো ফুলের মরসুম, ঢালো শারাব সাকী’, ‘করুণ কেন অরুণ আঁখি দাও গো সাকী দাও শরাব’, ‘গুলবাগিচার বুলবুলি আমি’ প্রভৃতি।

গজলে বিধৃত নজরুলের রোমান্টিক প্রেমকল্পনা সুরের বিচিত্র প্রবাহে বাজায় হয়ে উঠেছে। সুরের লালিত্য ও মোহনীয়তা গজলের অনেক অকিঞ্চিৎকর ভাবকে অসামান্য করে তোলে, বাণী ও সুরের সমন্বয়ে সৃষ্ট আমেজে শ্রোতা সম্মোহিত হয়। নজরুল গজল গানে রাগ-রাগিণী ব্যবহার করে নতুনত্বের জন্ম দিয়েছেন যা শ্রোতাকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু তিনি গোটা গানের মেজাজে অকস্মাৎ বদল ঘটিয়ে দেন ‘শেয়র’ যোগ করে। খেয়াল গানে যেমন তাল ও ছন্দের মধ্যেই, তাল ছেড়ে তালের বাইরে সুর বিস্তার করা হয়, নজরুল গজলে সেই সুরবিস্তার আনলেন, কিন্তু তাল ছেড়ে। গজলে তাল বাদক সাময়িক বিরতি পান, সেই সময়ে গায়ক গানের কোনো চরণকে সুরের বিস্তার এবং কারুকাজ দিয়ে অলংকৃত করে তোলেন। এর পরে আবার পূর্ব তাল লয়ে গান শুরু হয়। তাল ছাড়া ওই সুর বিস্তারই ‘শেয়র’। সাধারণত কোনো চিত্রধর্মী বর্ণনা অথবা কোনো গভীর ভাবাংশ শেয়রের অন্তর্গত থাকে, এর ব্যতিক্রমও থাকতে পারে। শেয়র সুরে নাটকীয়তা যেমন সৃষ্টি করে, তেমনি শ্রোতার অতিরিক্ত মনোযোগ আকৃষ্ট হয় সুর বৈচিত্র্যের প্রতি। তালের সহযোগ বাণীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে শ্রোতার হৃদয়ে সঞ্চারিত হতে সাহায্য করে, কিন্তু স্থায়ী হতে সাহায্য করে না। শেয়রে বিধৃত অংশ নতুন অর্থ ও বর্ণে শ্রোতার হৃদয়ে স্থায়ী হয়ে যায়। নজরুলের অনেক গজল আবার শেয়র ছাড়াই রচিত।

গজলে নজরুল মূলতঃ ভৈরবী, কাফি, পিলু, খাম্বাজ প্রভৃতি রাগ ব্যবহার করেছেন, তবে ভৈরবীর ব্যবহারই বেশি। কেননা ভৈরবী রাগ লঘু ও গভীর উভয় ভাবকে

নজরুলের গান : বাণী ও সুর

উন্মোচন করতে সাহায্য করে। তবে লক্ষণীয় তিনি গজলে হুবহু রাগের ব্যবহার করেন নি বা সব সময়ে একটি রাগের আশ্রয় নেন নি। কখনো কখনো একাধিক রাগের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। আবার রাগ-রাগিণীর সুর তার নিজস্ব সুর-কল্পনার সঙ্গে মিশে এক একটি নিটোল সুরমূর্তি নির্মাণ করেছে।

তার বিখ্যাত ‘বাগিচায় বুলবুলি তুই’ গান ভৈরবীর সুরে বিন্যস্ত। তিনি এই গানে বাণী এবং সুরের এমন মিলন ঘটিয়েছেন যে, তা কখনোই পুরানো হয়না, কেবলই নতুন হয়ে দেখা দেয়। করুণাময় গোস্বামী যথার্থ বলেন ‘এই অলৌকিক বুলবুলিকে মিনতির আর শেষ নেই’।^৪ তেমনিভাবে বলতে পারি ‘পাষাণের ভাঙলে ঘুম’ গানের কথা। (এই গানের অন্তর্বেদনাকে ভীমপলশ্রীর সুর আজো নতুন করে জাগিয়ে দেয়।) এছাড়া ‘চেয়োনা সুনয়না’ গানে পূর্বাস্ত্রে বাগেশ্রী এবং উত্তরাস্ত্রে পিলুর মিশ্রণ, ‘বসিয়া বিজনে’ গানে পিলু ও বারোয়ার মিলন, ‘কেন আনো ফুল ডোর’-এ ভীমপলশ্রী, ‘কেমনে রাখি আঁখি বারি চাপিয়া’-য় দুর্গার প্রয়োগ, গানের ভাবার্থকে প্রায় চিরন্তনত্বের দিকে নিয়ে যায়।

নজরুলের দেশাত্মবোধক গান যুগের প্রয়োজন মিটিয়েও আজ পর্যন্ত জীবিত, যে-কোনো সংগ্রামে প্রেরণার উৎস। কিন্তু তাঁর গজলের প্রয়োজন বোধ করি কোনোদিনও ফুরোবেনা, নজরুলের গজলের সাম্প্রতিককালের জনপ্রিয়তা তারই প্রমাণ।

৪.

এরপরে নজরুলের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হলো কাব্যগীতি। তাঁর কাব্যগীতির মধ্যে প্রেম, প্রকৃতি এবং অন্যান্য নানান বিষয়ক গান অন্তর্ভুক্ত হলেও, প্রেমের গানের সংখ্যাই বেশি, প্রকৃতি বিষয়ক গানের সংখ্যা কম। তিনি প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন মানব-মানবীর প্রেমের অনুমুগ্ন হিসেবে।

নিছক প্রেমমূলক গজলও এক অর্থে কাব্যগীতি, কিন্তু তার রচনাগত বৈশিষ্ট্য এবং সুরকর্মের স্বাতন্ত্র্যের কথা মনে রেখে গজলের বাইরে যে সব প্রেমের গান তিনি রচনা করেছেন, প্রধানত সেগুলিকেই কাব্যগীতি বলতে চাই। নজরুলের এই শ্রেণীর গানকে ‘আধুনিক বাংলা গান’ বলতেও বাধা নেই। ‘আধুনিক বাংলা গান’ নামাঙ্কিত অতি পরিচিত ও জনপ্রিয় বাংলা গানের যে-শাখাটি সম্প্রতি চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে নষ্ট স্রোতে প্রবাহিত হচ্ছে, তার সম্ভাবনাময় বর্ণিল উদ্ভবের সঙ্গে নজরুল যুক্ত ছিলেন। যুক্ত ছিলেন, না ব’লে বলতে হবে তিনি আধুনিক বাংলা গানের আঙ্গিক ও সুরের প্রবর্তক।

নজরুলের পূর্বে এই ধারার শ্রেষ্ঠ গীতরচয়িতা হলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পরে এই গানের ধারা প্রায় রুদ্ধ হয়ে পড়েছিলো। কেননা রবীন্দ্র সঙ্গীত আমাদের মনের

সাহিত্যিকী

সব চাহিদা এবং দাবী পূরণ করছিলো ষোল আনা। রবীন্দ্রনাথের গান হয়ে উঠেছিলো আমাদের জীবন-সঙ্গীত। ফলে এ গান সৃষ্টির কোনো প্রেরণা বোধ করছিলেন না কেউ। এই সময়েই নজরুলের আবির্ভাব। তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে আলাদা হয়ে যান নরনারীর প্রেমের অনুভব এবং তার বাণীরূপ নির্মাণের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে মানব মানবীর মর্ত্য-কামনা-বাসনার চেয়ে তার সূক্ষ্ম প্রেমানুভব, যা প্রায় অতীন্দ্রিয় প্রেমের কাছাকাছি, তারই স্নিগ্ধ-সুন্দর রূপায়ণ ঘটেছে। কিন্তু নজরুলের প্রেমে অপার্থিবের ছায়া বা ব্যঞ্জনা নেই; বরং তাঁর প্রেমপিপাসা একান্তই মর্ত্য-মানবীয়। সেখানে দেহাবেগের বর্ণনায় শূচিতার অশ্রু বা অতিরেক নেই। মিলন বিরহের অনুভূতি বর্ণনায় দেহের প্রসঙ্গে এসেছে অবাধে। এইভাবে নজরুলের হাতে প্রণয়ভিত্তিক বাংলা গানের কালান্তর সূচিত হয়। সেই সঙ্গে তিনি সুরেরও মুক্তি ঘটিয়েছেন। রাগ-রাগিণীর বৃত্তে এই গান আর বদ্ধ থাকে না, নানান রাগের যেমন অবাধ মিশ্রণ ঘটে, তেমনি চলতি বহু অনভিজাত সুরও সানন্দ প্রশ্রয় পেয়ে যায়। বিভিন্ন বিচিত্র সুরের মিলন-মিশ্রণই এই গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত হয়।

প্রবল আবেগময়তা নজরুল কাব্যের প্রধান চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। বলা বাহুল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই আবেগ উচ্ছ্বাস অপ্সাধিত এবং অসংহত। কিন্তু কবিতার মতো বৃহৎ পরিসর নয় বলেই হয়তো, স্বপ্নায়তন প্রেমের গানে তাঁর আবেগ সংহত এবং গভীর। আর তাঁর সহজাত রোমান্টিক কল্পনার অভিক্ষেপ তাকে যেমন প্রাণময় করে তোলে, তেমনি প্রকৃতি ও আমাদের প্রত্যাহের শত সহস্র উপমা-উৎপ্রেক্ষা চিত্রকল্পের সহযোগে তা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। তবে এই বৈশিষ্ট্যগুলি নজরুলের বেদনার গানেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রেমের গানে বেদনার বাণীপ্রতিমা নির্মাণে তাঁর সমকালে তিনি ছিলেন অনন্য সাধারণ।

উপমা

নজরুলের একটি বিখ্যাত গান ‘তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি’ এতে প্রিয়াকে মুগ্ধ চোখে দেখতে চাওয়ার আনন্দ ও ব্যাকুলতা একটা সূক্ষ্মবেদনার রসে সিঞ্চিত হয়েছে। উপমার পর উপমা প্রিয়ার সামনে জড়ো করা হয়েছে প্রিয়ার মিনতির স্বপক্ষে—অনেকটা সাক্ষ্য প্রমাণের মতো। কিন্তু এই সব যুক্তি প্রমাণকে বুঝি ছাড়িয়ে যায় প্রিয়ার শেষ কথাটি—‘হেরিতে তোমার রূপ মনোহর পেয়েছি এ আঁখি ওগো সুন্দর’। কোনো অদৃষ্ট নারীর গোপন আবির্ভাব ও রহস্যময় প্রস্থান এক শূন্যতা এবং হাহাকারের ধূসরপটে কল্পিত হয়েছে ‘গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙ্গে যায় কে যেন আমারে ডাকে’-গানে। বাগেশ্রীর সুর এই হাহাকারকে আমাদের সমগ্র সত্তায় অব্যর্থভাবে গেঁথে দেয়। একই হাহাকারের ধ্বনি সমরূপ পরিস্থিতিতে গুনতে পাই ‘তোমারি আঁখির মতো আকাশের দু’টি তারা’ গানে। বেদনার এমন অসাধারণ গানের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করিঃ ‘আমায় নাহেগো ভালবাস

দুঃখ

ওধু ভালবাস মোর গান’ ‘নয়ন ভরা জলগো তোমার আঁচল ভরা ফুল,’ ‘গভীর রাতে জাগি

নজরুলের গান : বাণী ও সুর

খুঁজি তোমারে,' 'অন্ধকারে এসে তুমি অন্ধকারে গেছ চলে,' 'যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই,' 'আমি চিরতরে দূরে চলে যাবো'-এমনই আরো শত-সহস্র গান স্মরণ করা যায়।

৫.

নজরুলের সাঙ্গীতিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে রাগশ্রয়ী বাংলা গানে। কেননা তাঁর অন্যান্য গানে বাণী ও সুরে প্রায় সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; বাণীরূপ নির্মাণে তাঁর কল্পনা লীলায়িত হয়েছে সুর-ভাবনার সান্নিধ্যে, সুরের ভাবরসটাই সেখানে মুখ্য। কিন্তু রাগভিত্তিক গানে সুরের রূপ এবং ভাব ব্যঞ্জনা উভয়ই মুখ্য। বাণীর ব্যঞ্জনা তাকে অনুসরণ করে প্রস্ফুট হয়, গানের ভাব এবং অন্তর্নিহিত আবেগ বিশেষ রাগের সুর বিস্তারের মধ্যে ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে। অর্থাৎ সুরের হৃদহৃন্দে বাণী-প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

নজরুল বাংলা খেয়াল বা হিন্দিভাঙ্গা বাংলা গান এবং রাগপ্রধান বাংলা গান রচনা করেন। নজরুলের আগে নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৯), কালী মির্জা (১৭৫০-১৮২০) প্রমুখ ওণী শিল্পী এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগ নেন। নিধুবাবুর গান জনপ্রিয় হয়, একথা সবার জানা। তাঁদের পরে রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় (?-১২৭৯ বঙ্গাব্দে) হিন্দি খেয়ালের বাংলা অনুবাদ করেন।

নজরুলের প্রতিভা রাগশ্রয়ী গানের শীর্ণ প্রবাহে বিচিত্র স্রোতধারার সম্মিলন ঘটায়। গজলের মতো তিনি এখানেও সম্ভাবনাকে সাক্ষ্যে উত্তীর্ণ করেন। বাংলা খেয়াল আসলে হিন্দি খেয়ালের অবিকল অনুসরণ, বাণী শুধু বাংলা। হিন্দি খেয়ালের অবিকল অনুকৃতি বলে এই গান 'হিন্দি ভাঙ্গা খেয়াল' বা 'ভাঙ্গা খেয়াল' নামেও পরিচিত। রাগপ্রধান হলো রাগ-রাগিণী ভিত্তিক রোমান্টিক কাব্যগীতি। এর কাব্যের ভাবাংশ আধুনিক বা রোমান্টিক, সুরের অংশ ব্লগসিকল।^{১৭} রাগপ্রধান বাংলা গানের তুলনায় নজরুলের বাংলা খেয়ালের সংখ্যা কম।

নজরুলের এই শ্রেণীর গানের আলোচনা করার সময়ে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রসঙ্গ আসে। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে ধ্রুপদকে আদর্শ হিসেবে নিয়েছিলেন। ধ্রুপদের নিয়মানুগতা শিল্পীর সৃজন-স্বাধীনতার স্বাভাবিক বিকাশের জন্যে অনুকূল নয়, একথা স্বীকার করতে হবে। সম্ভবত একারণেই ধ্রুপদ থেকে খেয়াল-ঠুংরীর উৎপত্তি। খেয়াল মুসলমান ওস্তাদগনের সৃষ্টি। তাঁরা খেয়াল গানে স্ফূর্তির সঙ্গে সঙ্গে যেন মুক্তিরও সন্ধান পান। খেয়াল উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত। এর সঙ্গে মিশেছে এই অঞ্চলের প্রচলিত লোকসঙ্গীতের ধারা।

সাহিত্যিকী

ঋপদাশ্রয়ী বলে রবীন্দ্রসঙ্গীতে শিল্পীর স্বাধীনতা পূর্ব নির্দিষ্ট বা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু নজরুল আদর্শ হিশেবে বেছে নিয়েছিলেন উত্তর ভারতীয় রাগ-সঙ্গীত অর্থাৎ খেয়াল ঠুংরী ইত্যাদি। সেই সাথে অনিবার্যভাবে এসেছিলো ওই অঞ্চলের লৌকিক বিভিন্ন সুর।

নজরুল রচিত বাংলা খেয়ালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ‘মেঘ মেদুর বরষায়’, ‘গুঞ্জ মালা দোলে কুঞ্জে এসো হে কালা,’ ‘শূন্য এ বুকে পাখী মোর’, ‘বাজে মৃদঙ্গ বাজে’; ‘অরুণকান্তি কেগো যোগী’, ‘কুহু কুহু কোয়েলিয়া’ প্রভৃতি। এগুলি যথাক্রমে জয়জয়ন্তী, মালগুঞ্জ, ছায়ানট, দরবারী কানাড়া, ভৈরবী ও খাম্বাজ রাগে রচিত।

নারায়ণ চৌধুরী নজরুলের কিছু বাংলা খেয়ালের উল্লেখ করেছেন, যেগুলির বাণী উৎস কোনো না কোনো হিন্দি খেয়ালের গীতরূপ। যেমন, ‘গুঞ্জমালা দোলে,’ ‘একি তন্দ্রাজড়িত আঁখি পাত,’ ‘কুহু কুহু কোয়েলিয়া’ এবং ‘পিউ পিউ বিরহী পাপিয়া’ গানে মূলে আছে যথাক্রমে মালগুঞ্জ রাগে রচিত ‘মুরলী কি ধ্বনি শুন সখিরি আজু,’ বিখ্যাত মালকোষ রাগের ‘মুখ মোর মোর মুসকত,’ খাম্বাজে বিন্যস্ত ‘ন মানুঙ্গী ন মানুঙ্গী’ এবং ললিত রাগ ভিত্তিক ‘পিউ পিউ রটত পাপিহারা’ গানের বাণী।^{১৬}

এবারে নজরুলের, রাগসহ কয়েকটি রাগপ্রধান বাংলা গানের উল্লেখ করি। যেমন, ‘আজো কাঁদে কাননে’-কেদারা, ‘শাশানে জাগিছে শ্যামা’-কৌশকী কানাড়া ‘শ্যামা তব্বী আমি মেঘ বরণা’-মেঘ, ‘নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে’-বেহাগ, ‘গভীর নিশীথে জাগি খুঁজি তোমারে’ এবং ‘কেন মেঘের ছায়া আজি চাঁদের চোখে’-দরবারী কানাড়া, ‘অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে’-তিলং। এই গানগুলি রাগের সাহচর্য পেয়েছে, কিন্তু শাসন পায়নি। রাগের আবহে গানগুলির বাণী স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়েছে, রাগের সুর স্বচ্ছন্দে বিহার করে বাণীর সঙ্গে আশ্বাদ্য করে তুলেছে। গানের মর্মবাণী কখনোই সুরের বাঁধনে ও আবরণে চাপা পড়ে নি—এই জাতীয় গানে যার সম্ভাবনা থাকে খুবই বেশি।

রাগসঙ্গীতের প্রতি নজরুলের গভীর অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসা এবং এর মর্মমূলে প্রবেশের জন্যে সনিষ্ঠ অনুধ্যানের পরিচয় পাই, তাঁর লুপ্তপ্রায় রাগ রাগিণীর পুনরুদ্ধার এবং নতুন রাগ-রাগিণী সৃষ্টি মধ্যে। এ কেবল সঙ্গীত শিল্পীর কাজ নয়, গবেষকেরও।

০

অনেক ভারতীয় রাগরাগিণী স্বল্প ব্যবহারে এবং অব্যবহারে লুপ্ত হতে বসেছিলো। বিভিন্ন সঙ্গীতগ্রন্থ থেকে তিনি প্রচণ্ড পরিশ্রম করে সেগুলি উদ্ধার করতে থাকেন। তাছাড়া রাগসঙ্গীত নিয়ে কাজ করতে গিয়ে নিজেও নতুন রাগ-রাগিণী সৃষ্টির প্রেরণা বোধ করেন। সেই সময়ে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে তিনি ‘হারামণি’ ও ‘নবরাগ

নজরুলের গান : বাণী ও সুর

মল্লিকা' নামে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দু'টি অনুষ্ঠান করতেন। সেগুলিতে যথাক্রমে লুপ্ত রাগ-রাগিণী এবং তাঁর সৃষ্ট রাগের পরিচয় তুলে ধরতেন।

নারায়ণ চৌধুরী এবং আব্দুল আজীজ আল-আমান লুপ্তপ্রায় এবং নজরুল সৃষ্ট রাগ রাগিণী ভিত্তিক কিছু গানের পরিচয় দিয়েছেন। সেখান থেকে প্রথমে 'হারামণি' পর্যায়ের কয়েকটি গান রাগসহ উল্লেখ করছিঃ

'আমি পথ মঞ্জুরী'- পটমঞ্জুরী, 'চাঁদিনী রাতে মল্লিকা লতা'- চাঁদিনী কেদারা, 'বসন্ত মুখর আজি'-বসন্ত মুখারী, 'নারায়ণী উষা খেলে হেসে'-নারায়ণী, 'নীলাম্বরী শাড়ি পরি নীল যমুনায় কে যায়'-নীলাম্বরী প্রভৃতি।^৭ এই গানগুলি সেকালে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। লক্ষণীয় উল্লিখিত গানগুলিতে ব্যবহৃত রাগের নাম চমৎকারভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলি ছাড়াও তিনি অনেক হারিয়ে যাওয়া রাগ উদ্ধার করেন।

তাঁর নিজের রচিত রাগ-রাগিণীর উপর ভিত্তি করে রচিত গানের চরণেও ব্যবহৃত রাগগুলির নামের উল্লেখ দেখি। যেমন 'চপল আঁখির ভাষায় হে মীনাক্ষি' গানটি 'মীনাক্ষি' রাগের আশ্রয়ে গঠিত; 'অরুণ ভৈরবী' রাগ ব্যবহৃত হয়েছে 'জাগো অরুণ ভৈরব' গানে। 'দোলন চাঁপা বনে দোলে' গানের ভিত্তি 'দোলন চাঁপা' রাগ। আবার অনেক গানে নজরুল একাধিক রাগের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

৬.

ভক্তিগীতি রচনা নজরুলের উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এই গান তিনি শুধু সৃষ্টির আনন্দেই রচনা করেন নি, গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং আত্মনিবেদনের বাণী এতে ধ্বনিত। হিন্দুমুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চেতনা তাঁর গানে সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে। বাঙ্গালী কোনো কবির গানে এই উভয় ধর্মের সম্মিলন ঘটেনি।

নজরুল এক সময়ে কালীভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কালী সাধনার বিবরণ পাই নানান সূত্র থেকে। কালীবন্দনামূলক গান 'শ্যামাসঙ্গীত' বলে পরিচিত। নজরুলের আগে সাধক রামপ্রসাদ (১৭২০-১৭৮১) এবং কমলাকান্ত (১৭৭২-১৮১১) শ্যামাসঙ্গীত রচনা করে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। নজরুল অজস্র শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন। রাম প্রসাদ ও কমলাকান্তের গানে ভক্তির সহজ প্রকাশ আছে, বাস্তব সমাজ ও জীবন থেকে আহৃত অনেক বিষয় ও প্রসঙ্গ ভক্তি প্রকাশের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর সুরে আছে এক ধরনের কোমলতা।

সাহিত্যিকী

নজরুল-রচিত শ্যামাসঙ্গীতে অনিবার্যভাবে এসেছে অজস্র উপমা, উৎপ্রেক্ষা এবং প্রতীক। রামপ্রসাদী সুর দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন নি-রাগরাগিনীর কোমল স্পর্শে সে গান ভিন্নধর্মী হয়ে উঠেছে।

‘শ্মশানে জাগিছে শ্যামা’ ‘বলরে জবা বল’ ‘কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন’; ‘জবারে তুই বল আমারে’, ‘আমি জবা হয়ে ফুটবো,’ ‘আমার মুক্তি নিয়ে কি হবে মা’ ইত্যাদি তার বিখ্যাত শ্যামাসঙ্গীত। লক্ষণীয় তাঁর অনেক শ্যামাসঙ্গীতে কালী মূর্তির চরণঅর্ধ অর্থাৎ জবা ফুলের উল্লেখ আছে। তিনি একাধিক গানে জবা ফুলকে প্রশ্ন করেছেন, কোন ভাগ্যগুণে বা সাধনার বলে সে শ্যামা মায়ের পায়ের তলায় স্থান পেয়েছে।

শুধু কালী বন্দনা নয়, কালীকে উপলক্ষ করে তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনাও প্রকাশিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ‘জাগো শ্যামা জাগো শ্যামা আবার রণচণ্ডী সাজে’, ‘আঁধার ভীত এচিত মাঝে’, ‘জাগো যোগমায়া’ ইত্যাদি গানের উল্লেখ করা যায়। শ্যামাসঙ্গীত ছাড়া তিনি কৃষ্ণবিষয়ক গানও রচনা করেন।

ধর্মবিশ্বাস

নজরুল ইসলামের ইসলামী গান একদা মুসলমান সমাজকে মাতিয়ে তুলেছিলো। অসংখ্য ইসলামী গান তিনি লিখেছেন। দু’টি ধর্মীয় বিশ্বাসকে কিভাবে তিনি এমন শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সঙ্গে গানে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেটি রীতিমত একটি রহস্য হয়ে রয়ে গেছে।

ইসলামী গানে তিনি ইসলাম ধর্মের আদর্শ এবং রসুলের প্রশস্তিসহ নানা ধর্মীয় প্রসঙ্গ এনেছেন। ধর্মীয় অববেগে ঐশ্বর্যে এই গানগুলি এমনই উজ্জ্বল, যে একদা মুসলমান সমাজের যেকোন সভা সমিতি এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সেগুলি ছিলো অপরিহার্য।

৪

হজরত মোহাম্মদের (দঃ) আবির্ভাব ও তাঁর মহিমাজ্ঞাপক কয়েকটি গান অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিলো। এগুলির মধ্যে ‘ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলোরে দুনিয়ায়’, ‘তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে’ গান দুটি উল্লেখ্য।

হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনাদর্শ নিয়ে রচিত একটি গান এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। গানটি হলো ‘একোন মধুর শারাব দিলে’। এই গানে, ইসলামধর্মে নিষিদ্ধ পানীয় সুরা এবং তার নেশার কথা চমৎকারভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। নবীর উদ্দেশে বলা হয়েছে, তাঁর আদর্শের মধুর নেশায় কবি ‘দেওয়ানা’ হয়েছেন। তাঁর প্রেমে মানুষ সম্মোহিত হয়ে অন্তরের সব কিছু ‘নজরানা’ স্বরূপ বিলিয়ে দিয়ে কাস্তাল হবার জন্যে

নজরুলের গান : বাণী ও সুর

উন্মুখ।- নজরুলের আগে কোনো মুসলমান কবি এদেশে ইসলামধর্ম নিয়ে এমন ভক্তিগীতি রচনা করেন নি।

রোজা, মহররম, ঈদ, কোরবানী ইত্যাদি নিয়েও তিনি অনেক গান লিখেছেন। আব্বাস উদ্দীনের (১৯০১-১৯৫৯) কণ্ঠে রেকর্ডকৃত ‘ওমন রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ’ গানটি বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো।

নজরুল অনেকগুলি হাসির গান রচনা করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান এক সময়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলো। রবীন্দ্রনাথও হাসির গান লিখেছিলেন। নজরুলের হাসির গানের বৈশিষ্ট্য এই, তা শুধুই দৈনন্দিন জীবনের অসঙ্গতি এবং লঘু প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত নয়; তাঁর অনেক গানের বিষয়বস্তু রাজনৈতিক ঘটনা ও সিদ্ধান্ত এবং রাজনৈতিক ভগ্নামি, ধর্মীয় অস্তঃসারশূন্যতা কখনো কখনো এর বিষয়বস্তু হয়েছে।

‘আমার হরিনামের রুচি কারণ পরিণামে লুচি’, ‘প্রিয়ার চেয়ে শালী ভালো’, ‘আমার খোকার মাসী’ ‘আজকে হইব মোর বিয়া’, ‘টিকি আর টুপিতে লেগেছে দ্বন্দ্ব’, ‘বদনা গাড়তে মুখোমুখি’ ‘দড়াদড়ির লাগবে গিট’- ইত্যাদি তাঁর জনপ্রিয় হাসির গান।

৭.

নজরুলের কয়েক শ্রেণীর গান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এছাড়াও তিনি লিখেছেন অনেক লোকগীতি-যার মধ্যে আছে ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, বাউল, কাজরী ইত্যাদি। এগুলির বিস্তারিত আলোচনা করা হলো না বটে, তবে বাংলা গানের ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব অকিঞ্চিৎকর নয়।

নজরুল ইসলাম বাংলাসাহিত্যে নন্দিত ‘বিদ্রোহী কবি’ হিসেবে। কিন্তু তাঁর বিদ্রোহ শুধুমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; এমনকি ব্যক্তিগত স্বভাবে, চরিত্রে, জীবনচরণ সর্বক্ষেত্রে এই বিদ্রোহ। তাঁর বিদ্রোহের লক্ষ্য শুধুই ভেঙ্গে চলা নয়—যা কিছু পুরাতন, জীর্ণ এবং মানুষের জন্যে অকল্যাণকর, তাকে ভেঙ্গে-গুড়িয়ে মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির জন্যে নতুনের অনুসন্ধান করা তাঁর বিদ্রোহের লক্ষ্য।

বাংলা গানের বেলায়ও একথা সত্য। তিনি বাংলা গানে পুরাতন প্রবাহকে সরিয়ে দিয়ে নতুন প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন। বাংলা গানের বাণী ও সুর তাঁর হাতে মুক্তির সন্ধান পেয়েছিলো। তিনি গানকে জীবন-ঘনিষ্ঠতা দান করেছিলেন। প্রেম, বাংলা গানের প্রাণবস্তু—কিন্তু নজরুলপূর্ব বাংলা গানে এই প্রেম অপার্থিব এবং অপার্থিবের রহস্যে আবৃত ছিলো। নজরুলের প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তিনি বাংলা গানে প্রেমকে অতীন্দ্রিয়তা থেকে মুক্ত করে মর্ত্যে এনেছেন, আর রাগরাগিণীর সুরকে এই গানে স্বচ্ছন্দ বিহারের পথ করে দিয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ

- ১ মুজফ্ফর আহমদ, 'নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা', ৩য় প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৫৮-৫৯।
- ২ সুধীর চক্রবর্তী, 'আধুনিক বাংলা গান', কলিকাতা, ১৩৯৪, পৃ. ২৫।
- ৩ ঐ, পৃ. ২৪।
- ৪ 'নজরুল রচনাবলী', ১ম খণ্ড, নতুন সংস্করণ, (পুনর্মুদ্রণ), ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৮৭৬।
- ৫ আতাউর রহমান, 'নজরুল কাব্য সমীক্ষা', ৪র্থ প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ২৬৯।
- ৬ উদ্ধৃত, 'সুশীলকুমার গুপ্ত, নজরুল চরিতমানস', কলিকাতা, ১৩৬৭, পৃ. ৯৩।
- ৭ দিলীপকুমার রায়, "আলোর বাণীবহ", 'নজরুল কথা', (স.) বিশ্বনাথ দে, কলিকাতা, ১৩৮৯, পৃ. ৮৮-৮৯।
- ৮ মুজফ্ফর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯১।
- ৯ আতাউর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯।
- ১০ পরিমল গোস্বামী, "দেশাত্মবোধ ও কবি নজরুল", 'নজরুল কথা', পৃ. ২৪৪।
- ১১ 'নজরুল রচনাবলী', প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮২৪।
- ১২ আবু সয়ীদ আইয়ুব, 'গালিবের গজল থেকে', দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ৯-১০।
- ১৩ করুণাময় গোস্বামী, 'নজরুল গীতি প্রসঙ্গ', প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৭৩-১৮৮।
- ১৪ ঐ, পৃ. ১৭৪।
- ১৫ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ. ২১৯-২২৪।
- ১৬ উদ্ধৃত, ঐ, পৃ. ২২২।
- ১৭ দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ. ২২২।